তাই বলা যায় ব্যাপক অর্থে শিশুর শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শিক্ষা, এমনকি বয়স্ক শিক্ষাও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি উপায়। আধুনিক সমাজে প্রথাগত বা বিধিবদ্ধ শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে যার ফলে তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। শিক্ষালয় সমাজের নতুন প্রজন্মকে সামাজিক আদর্শ ও মানকে শ্রদ্ধা করতে, রক্ষা করতে এবং অনুসরণ করতে শেখায়। এর ব্যতিক্রম হলে শিক্ষার্থী শাস্তি পায়। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সামাজিক স্তর বিন্যাসে নিজেদের অবস্থান, দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করে নিজেদের সেইমত তৈরী করে; শিক্ষা তাদের সাহায্য করে। সবশেষে Bottomore-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায় — "In modern societies, where formal education is predominant. .....education is also a major type of social control, which is in competition and sometimes in conflict with other types of control"।

● **(৩) বল প্রয়োগ (Coercion) ঃ**

অনেক সময় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। কোন অসামাজিক বা অবাঞ্ছিত আচরণ যদি বুঝিয়ে পরিবর্তিত না করা যায় তখন বল প্রয়োগ বা পেশীশক্তি প্রয়োগ করে তা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা ঠিক এই কারণেই ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি প্রদান করেন। সমাজে যারা অসামাজিক বা অবাঞ্ছিত আচরণ করে তারা প্রায়ই জনগণের হাতে বা পুলিশের হাতে প্রহৃত হয়। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে এই বল প্রয়োগে রাষ্ট্রের সম্মতি বা অনুমোদন থাকে, আবার অনেক সময় জনগণ আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। এটা কিন্তু কোন কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা এই জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান, তা সে যে প্রকারেরই হোক না কেন, এ জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকারী নয়। অন্য কোন উপায় ব্যর্থ হলে তবেই রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে — যেটা একটা অশুভ সঙ্কেত বহন করছে। তবে সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুশাসন বজায় রাখতে হলে দৈহিক বল প্রয়োগ না করেও চাপ সৃষ্টি করা যায়। কারখানার শ্রমিকেরা তাদের দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করে, ধর্মঘট করে। গান্ধীজি ইংরেজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বয়কট, অসহযোগ প্রভৃতি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আমাদের সমাজে প্রাচীনকালে 'একঘরে, জাতিচ্যুত, ধোপা-নাপিত-মুদি-বন্ধ' ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রয়োগ করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর চাপ সৃষ্টি করা হত। এইভাবে বল প্রয়োগ করে বা চাপ সৃষ্টি করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সামাজিক অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করলেও এর ফল সবসময় ভাল হয় না। এর ফলে সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর সম্পর্ক থাকে, তা নষ্ট হয়ে যায়।

❑ অ-বিধিবদ্ধ মাধ্যম (Informal Agency) ঃ

যে সমাজ গতিশীল এবং যার জীবনধারা গতানুগতিক, সে সমাজে বেশ কিছু অবিধিবদ্ধ মাধ্যমের (Informal Agency) সন্ধান পাওয়া যায় যার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

(১) সামাজিক প্রথা (Custom)
(২) লোকাচার ও লোকপ্রথা (Folkways and Mores)
(৩) ধর্ম (Religion)
(৪) বিশ্বাস (Belief)
(৫) আদর্শ (Ideology)
(৬) শিল্প-সাহিত্য (Art and Literature)
(৭) নৈতিকতা (Morality)
(৮) প্রচার/জনমত (Propaganda, Public Opinion) ইত্যাদি।

এখন এগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক —

● (১) সামাজিক প্রথা (Custom) ঃ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে সামাজিক প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কতকগুলি দলগত বা গোষ্ঠীগত রীতি বা আচরণবিধি যা সমাজের সদস্যদের নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই রীতিনীতি বা আচরণধারা সমাজের ব্যক্তিদের একসঙ্গে ধরে রাখে এবং সমাজ অনুমোদিত আচরণধারা ব্যক্তিদের মধ্যে সঞ্চালিত করে। তাছাড়া প্রতি সমাজ আচরণধারার একটি মাত্রা বা মান স্থির করে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত প্রথা মেনে চলতে চলতে সেগুলি কালক্রমে ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সমাজ ব্যক্তিদের এইসব প্রথা মেনে চলতে বাধ্য করে। এই সমস্ত সামাজিক প্রথা মেনে চলতে পারলেই সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকে। আদিম মানুষদের জীবনধারায় এই সামাজিক প্রথার বিশেষ প্রাধান্য ও গুরুত্ব ছিল। বর্তমানকালেও এর গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। এই সমস্ত প্রথার দ্বারা ব্যক্তিকে সামাজিক আচরণ করার দিকে অর্থাৎ সামাজিকীকরণের দিকে পরিচালিত করা সম্ভব। এই সমস্ত প্রথা সমাজের প্রচলিত এবং জনপ্রিয় ঐতিহ্য এবং লৌকিক ধারণাকে (myth) ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রথাগুলি আমাদের সামাজিক উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্যের ভাণ্ডার। এগুলি থেকে আমরা সমাজ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারি। বহু যুগ ধরে এই সমস্ত প্রথা সমাজে চলে আসছে এবং এগুলি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এগুলি আমাদের আচরণধারা একটি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা অনেক সময় বিশ্বাস করি যে এই সমস্ত প্রথা স্বয়ং ঈশ্বর নির্ধারণ করেছেন এবং এগুলির অলৌকিক বা দৈব

ক্ষমতা বিদ্যমান। আমরা প্রায় অজান্তে এগুলি অনুসরণ করি, কিন্তু উদাসীনভাবে নয়। প্রথাগুলির সঙ্গে একটা বিশেষ আবেগ বা সেন্টিমেন্ট জড়িত থাকে ও প্রথার কোন একটি অংশ বাদ গেলে আমরা আচরণ সম্পূর্ণ হল না বলে ধরে নিই এবং তার ফলে কিছু অমঙ্গলের আশঙ্কা করি। বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সামাজিক কার্যাবলী প্রথা হিসাবে বিবেচিত। এক-এক সমাজে এক-একভাবে এগুলি অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু ঐ সমাজের সকল সদস্য একইভাবে ঐ সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। এই প্রথাগুলির মধ্যে তিনটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় — একটি বিশেষ জাতীয় আচরণধারা, সামাজিক প্রকৃতি এবং একটি আদর্শ বা মানগত মূল্যায়ন। প্রথাগুলি সামাজিক মূল্যবোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। শৈশব থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত এই প্রথাগুলি প্রতিটি সামাজিক সদস্যের আচরণধারা নিয়ন্ত্রিত করে ও বিচ্যুতি থেকে তাদের নিরস্ত করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি যে বিশেষ গোষ্ঠী, দল বা সমাজের সদস্য তা বোঝা যায়।

● (২) লোকাচার ও লোকপ্রথা (Folkways and Mores) ঃ

প্রতি ব্যক্তিকেই সমাজে কিছু আচার-আচরণ সম্পাদন করতে হয়। সমাজ যখন এই সমস্ত আচার-আচরণকে স্বীকৃতি দান করে তখন তাকে বলা হয় লোকাচার। যখন কোন লোকাচার গোষ্ঠীজীবন বা সমাজজীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর বলে মনে হয়, তখন সেগুলিকে বলা হয় লোকনীতি। লোকাচার কতকগুলি বিশেষ জাতীয় আচরণ বা ব্যবহারবিধি। এগুলি সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত এবং সমাজের সদস্যদের এই জাতীয় আচরণ করার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়। এইসব আচরণ সুস্থ সমাজজীবন যাপন করার পক্ষে প্রয়োজন। Mac. Iver এবং Page-ও লোকাচারকে সমাজ স্বীকৃত বলে মেনে নিয়েছেন। বারবার অনুশীলন করতে করতে লোকাচারগুলি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং এই আচরণগুলি সম্পাদন করতে ব্যক্তির ভুল হয় না। লোকনীতির সঙ্গে ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ বোধ সম্পর্কযুক্ত এবং অনেক সময় নৈতিকতার সঙ্গে লোকনীতি যুক্ত। লোকনীতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে প্রতিটি সমাজ ব্যক্তির আচরণ লোকনীতির দ্বারা প্রভাবিত হোক এটাই চায় এবং লোকনীতির কোন বিরোধিতা সমাজ পছন্দ করে না। লোকনীতি না থাকলে সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হতে পারত না।

● (৩) ধর্ম (Religion) ঃ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকা অসামান্য। ধর্ম যে কোন সমাজে নৈতিক আদর্শের স্তম্ভস্বরূপ। ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক আচরণের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়। ধর্মই বলে দেয় কি ভাল বা নৈতিকতার দিক থেকে কি গ্রহণযোগ্য বা কোন্ আচরণ বর্জনীয়। ধর্ম যে সমস্ত আচরণ নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করে দেয় সেগুলিকে সর্বশ্রেষ্ঠ আচরণ বলে মনে করা হয় এবং ঐ সমস্ত আচরণের দ্বারা ভ্রাতৃত্ববোধ যেমন জাগ্রত হয় তেমনই ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ গুণাবলীরও সন্ধান পাওয়া যায়।

'ধর্ম' শব্দটির বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যা মানুষকে ধারণ করে, তাকেই বলে ধর্ম। ধর্মের কাজ হল একসূত্রে গ্রথিত করা, বিচ্ছিন্ন করা নয়। ধর্মের পতাকাতলে বহু মানুষ একত্রিত হয় এবং ধর্মীয় নির্দেশ বা অনুশাসন মেনে চলে। কোন একটি ধর্মমত গ্রহণ করলে তার নির্দেশ মেনে চলতেই হবে, বিরোধিতা করার কোন উপায় থাকে না। সুতরাং ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ খুব ভালভাবেই করে থাকে। আবার ধর্ম বলতে ঐশ্বরিক বা অতিপ্রাকৃত কোন শক্তির প্রতি বিশ্বাসবোধকেও বুঝিয়ে থাকে। ধর্ম মানুষের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করে। এই যে সম্পর্ক তার সঙ্গে যুক্ত আচরণকে বলা হয় ধর্মীয় আচরণ এবং এই আচরণের সঙ্গে যুক্ত হয় লোকাচার, লোকনীতি ও সামাজিক নিয়ম কানুন। ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মগুরুরা সেগুলি পরিচালনা করেন। এইসব ধর্মগুরু মানুষকে সৎ ও নৈতিক জীবনযাপন করার উপদেশ দান করেন এবং প্রয়োজনমত মেনে চলার জন্য পুরস্কার ও না মানার জন্য তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এরা মানুষের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে ঈশ্বর মানুষের সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করেন এবং কোন ধর্মীয় নির্দেশ না মানার অর্থ ঈশ্বরের সৃষ্ট নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে যাওয়া। সেরকম ক্ষেত্রে কোন ঐশ্বরিক বা অলৌকিক শক্তি তাকে শাস্তি দেবে। এইভাবে প্রাচীন যুগে ধর্মবোধের দ্বারা মানুষকে তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে বাধ্য করা হত। ধর্মের অনুশাসন সমাজের বন্ধনকে দৃঢ় করত। প্রাচীন ভারতে 'বর্ণাশ্রম' প্রথা জাতিভেদ সৃষ্টি করে সামাজিক স্তর বিন্যাস অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত করেছিল। আবার প্রত্যেক ধর্মে মানুষের ভাবনা-চিন্তার মধ্যে সমতা আনয়ন করার চেষ্টা করা হয়। প্রায় সব ধর্মেই মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মূলগত কারণ হিসাবে কোন অলৌকিক শক্তিকে দেখানো হয়। ধর্মের নামে নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান, কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাস, পশুবলি ইত্যাদি প্রচলিত হয়। কার্ল মার্কস কিন্তু ধর্মকে 'জনতার আফিম' বলে উল্লেখ করেছেন। তবুও বলতে হয় ধর্ম এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে চিন্তার ও আদর্শের একতা সৃষ্টি করে এবং বহু মানুষকে একটা ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করে। যাইহোক, সমাজে ধর্মের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ তেমন চোখে না পড়লেও ধর্ম যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

● (৪) বিশ্বাস (Belief) :

বিশ্বাস সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রত্যেক সমাজে মানুষের মধ্যে নানাপ্রকার বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায় এবং সেইমত মানুষের আচরণধারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন — কোন কোন সমাজে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকে এবং সেই সমাজের লোকজন এক বিশেষ পদ্ধতিতে আচরণ করে। আবার যে সমাজে এ জাতীয় বিশ্বাস অনুপস্থিত, তাদের আচরণধারা অন্য প্রকার হয়। এই বিশ্বাস মানুষকে

বিশেষ কোন আচরণে প্রবৃত্ত করে আবার বিশেষ কতকগুলি আচরণ থেকে তাদের নিবৃত্তও করে। বিশ্বাস একদিকে যেমন কতকগুলি সুস্থ ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক করে তেমনই বিশ্বাস থেকে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা বা কুসংস্কারেরও সৃষ্টি হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে তাকে বাঞ্ছিত আচরণের দিকে প্রবৃত্ত করে এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কটিকেও দৃঢ় করে।

● **(৫) আদর্শ (Ideology) ঃ**

যেখানে সমাজ আছে, সেখানেই একটি বিশেষ মতাদর্শ বা মতবাদ থাকবেই এবং সমাজ পরিচালিত হবে সেই মতাদর্শ অনুযায়ী। এই মতাদর্শই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। তবে কোন সমাজে একই মতাদর্শ চিরকাল স্থায়ী হয় না, পরিবর্তিত হয়। ভারতবর্ষে এককালে গান্ধীজির অহিংস মতবাদ প্রচলিত ছিল। আজ তার প্রভাব অনেক কম। সমাজে পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি মতাদর্শ বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত হয়ে সমাজের জীবনধারা পরিবর্তিত করে দিয়েছে। সমাজ যখন যে মতাদর্শে অনুপ্রাণিত বা উদ্বুদ্ধ হয় তখন সেই অনুযায়ী সদস্যদের আচরণধারা নিয়ন্ত্রিত করে। এই আদর্শবোধ থেকে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। আদর্শ সৃষ্টির পশ্চাতে কোন না কোন চিন্তাবিদ, দার্শনিক বা মনীষীর প্রভাব বর্তমান থাকে।

● **(৬) শিল্প-সাহিত্য (Art and Literature) ঃ**

শিল্প ও সাহিত্য যে কোন সমাজের রুচি বা উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করে। যে সমাজ যত উন্নত, তার শিল্প ও সাহিত্যও তত উন্নত। ব্যক্তি শিল্প বা সাহিত্যমনস্ক হলে তার রুচিও পরিশীলিত ও মার্জিত হয় এবং তার আচরণও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণভাবে আমরা শিল্প বলতে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং আরও কিছু নান্দনিক কলা, যেমন — নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকি। সাহিত্য বলতে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনাকে বোঝায়। শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে মানব সভ্যতার একটা সম্পর্ক আছে। আদিম মানব সমাজ তেমন সভ্য ছিল না বলে সে সময় আমরা শিল্প ও সাহিত্যের তেমন নিদর্শন দেখতে পাইনি। অনেকে তো শিল্প-সাহিত্যকে সভ্যতার ধারক এবং বাহক বলে মনে করেন। এই শিল্প-সাহিত্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কার্যকরী। শিল্প-সাহিত্যকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ নিজের আচরণধারাকেও উন্নত করার চেষ্টা করে। শিল্প ও সাহিত্য মানুষের রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধকে প্রভাবিত করে। উত্তম শিল্প ও সু-সাহিত্য সমাজের পক্ষে যেমন কল্যাণকর, তেমনই অত্যন্ত নিম্নমানের ও বিকৃত রুচির শিল্প ও সাহিত্য ব্যক্তিমানসে একটা কু-প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং সমাজকে উন্নত করতে হলে শিল্প-সাহিত্যেরও উন্নতি করতে হবে। প্রত্যেক সমাজে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ সম্মানের আসন থাকে। তাই বলা যায় শিল্প ও সাহিত্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম মাধ্যম।

● (৭) নৈতিকতা (Morality) ঃ

নৈতিকতা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নৈতিকতা বলতে যেমন ব্যক্তির সামগ্রিক আচরণধারার নৈতিক মানটি বোঝায়, তেমনই সমাজের জনগোষ্ঠীর জীবনধারার গড় মান বা আদর্শকেও বোঝায়। এই মান অনুযায়ী সমাজের ব্যক্তিরা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখে এবং সমাজের প্রতি তাদের আচরণধারা কিরকম হওয়া উচিত তা স্থির করে নেয়। আমরা সমাজে সেই আচরণকে সমর্থন করি যার মধ্যে নৈতিকতার গুণ স্পষ্ট। নৈতিক আচরণ সবসময় সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, শুভ ও ন্যায়সঙ্গত। যদি আচরণ সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর ও অন্যায় বলে মনে হয় তখন তাকে অনৈতিক আচরণ বলা হয়। নৈতিকতার নিয়মগুলি আচরণের ভিতরের কল্যাণকর দিকটি তুলে ধরে। সুতরাং এর মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া রয়েছে। কোন আচরণের মধ্যে অকল্যাণকর বা অমঙ্গলজনক কিছু থাকলে ব্যক্তিকে সে জাতীয় আচরণ করা থেকে নিবৃত্ত করা হয়। সেইজন্য সমাজে ব্যক্তিদের নৈতিক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয় কারণ সেই জাতীয় আচরণের মধ্যে বেশ কিছু বিমূর্ত গুণ বা নীতি, যেমন — ন্যায়, বিশুদ্ধতা, সমতা ইত্যাদি গুণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় আচরণের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল এর জন্য বাইরের কোন চাপ থাকে না; এই জাতীয় আচরণ করার প্রেরণা ব্যক্তি নিজের মনের থেকেই অনুভব করে। প্রায় প্রত্যেক সমাজ নৈতিকতার আদর্শ গ্রহণ করে নিয়েছে।

● (৮) প্রচার বা জনমত (Propaganda, Public Opinion) ঃ

প্রচার ও জনমত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রয়োজনীয় মাধ্যম। Kimball Young-এর মতে — "Propaganda is a deliberate use of symbols – that is words, pictures or gestures – with a view to influence people's belief and ideas and ultimately their actions"। প্রচার বা জনমত সমাজের সদস্যদের আচরণধারাকে নিয়ন্ত্রিত করার একটি কার্যকরী মাধ্যম। প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে খুব সহজে প্রভাবিত করা যায় বলে সরকার থেকে শুরু করে সবরকম সংস্থাই প্রচার মাধ্যমের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। কোন মানুষ নিজের সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা শুনতে চায় না, সে চায় প্রশংসা। সমালোচনাকে সকলে অপছন্দ করে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জনমত গঠন করে ব্যক্তির আচরণধারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তবে দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলে জনমত গঠন যত সহজে করা সম্ভব এবং তার সাহায্যে জনগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যত সহজ, শহরাঞ্চলে তত সহজ নয়। জনমতের বিরুদ্ধে কেউই যেতে চায় না বলে জনগণের দাবীমত আচরণধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং জনমত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি উত্তম মাধ্যম।